সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● তৃতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ● ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ● পাঁচ টাকা

যে দেশে মানুষ বড় পৃষ্ঠা ৩
সুন্দরবন রক্ষায় গণভোট পৃষ্ঠা ৪
আলুচাষীদের বিক্ষোভ পৃষ্ঠা ৫
নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে পৃষ্ঠা ৮

কমরেড লেনিন এর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ

বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ২১ জানুয়ারি মহামতি লেনিনের ৯৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য ওবায়দুল্লাহ মুসা, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন।

''...নারীদের অধিকারহীনতা, অথবা অ-রুশ জাতিসত্তাগুলির পীড়ন ও অসাম্যের কথা ধরুন। এ সবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ইতরেরা আট মাস ধরে এই নিয়ে বুলি ঝেড়েছে; বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী দেশের কোনো একটিতেও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধারায় এই সমস্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। আমাদের দেশে তার পুরো সমাধান হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের আইনবিধিতে। ধর্মের সঙ্গে আমরা সত্যিকারের লড়াই চালিয়েছি ও চালাচ্ছি। সমস্ত অ-রুশ জাতিসত্তাকে আমরা দিয়েছি তাদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র অথবা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। নারীদের অধিকারহীনতা বা পূর্ণাধিকারহীনতার মতো নীচতা, জঘন্যতা ও পাষণ্ডতা আমাদের রাশিয়ায় নেই, নেই এই ভূমিদাসপ্রথা ও মধ্যযুগীয়তার বিরক্তিকর জের, যা বিনা ব্যতিক্রমে গোলকের সমস্ত দেশেই অর্থ লোভী বুর্জোয়া আর নির্বোধ ভীতিগ্রস্ত পেটি বুর্জোয়াদের নতুন করে তোলে।

এসবই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারবস্তু। দেড় শ' ও আড়াই শ' বছর আগে এই বিপ্লবের (একই সাধারণ টাইপের প্রতিটি জাতীয় প্রকারভেদ ধরলে, এই সব বিপ্লবের) অগ্রণী নেতারা মধ্যযুগীয় বিশেষাধিকার থেকে, নারীদের অসাম্য থেকে, কোনো একটি ধর্মের (অথবা 'ধর্মের আইডিয়া', সাধারণভাবে 'ধর্ম ভাব') রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য থেকে, জাতিসত্তাগুলির অসাম্য থেকে মানবজাতির মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পূরণ করেন নি। পূরণ করতে পারেন নি, কেননা বাধা ঘটায়– 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' প্রতি 'শ্রদ্ধা' এই তিনগুণো অভিশপ্ত মধ্যযুগীয়তার প্রতি এবং এই 'পবিত্র ব্যক্তিমালিকানার' প্রতি এই অভিশপ্ত 'শ্রদ্ধাটা' আমাদের প্রলেতারীয় বিপ্লবে ছিল না।

কিন্তু রাশিয়ার সমস্ত জাতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই সুকৃতিগুলিকে সংহত করার জন্য আমাদের আরো এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং এগিয়ে আমরা গেছি।''

মহাজোট সরকারের ৩ বছর
উন্নয়নের শোরগোলে চাপা পড়ছে মানুষের আর্তনাদ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের এক কৃষক পিতার ছেলে তারেক ২০১৪ সালে মাস্টার্স পাশ করেছিলেন। বহু কষ্ট স্বীকার ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অভাবী পরিবারের ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার্স পাশ করেন। পাশ করার পর দুই বছর দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। কোথাও কোন চাকরি পাননি। বাবা আক্ষেপ করে ছেলেকে বলেছিলেন, "তাহলে পড়ালেখা না করে আমার সাথে মাঠে কাজ করলে পারতিস।" এ বছরের মে মাসে আজিজ আত্মহত্যা করেন।

জানুয়ারি মাসে আত্মহত্যা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাশ করা মানিকগঞ্জের ঘিওরের মেয়ে সুক্তি। প্রাণপণ চাকরির চেষ্টা করছিলেন তিনিও। একটা চাকরি ছাড়া তো টিকে থাকাও যায় না। তার উপর তিনি একজন মেয়ে। জীবন সংগ্রাম তার জন্য অন্যদের চেয়ে আরও একধাপ বেশি কঠিন। কিন্তু আর লড়তে পারলেন না সুক্তি।

দেশের বহুল প্রচারিত একটি প্রথম সারির দৈনিকে এই ঘটনাগুলো উঠে এসেছে। সেই রিপোর্ট দেখলেই আমাদের দেশের ভয়াবহ উন্নয়নের চিত্র বোঝা যাবে। দেশের স্নাতক ডিগ্রিধারির প্রায় অর্ধেকেরই (৪৭ শতাংশ) কোন কাজ নেই। সর্বাধিক বেকারত্বের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১২ তম।

এ এক অর্জনই বটে। এরকম বহু অর্জন নিয়ে গত ৫ জানুয়ারি মহাজোট সরকার ৩ বছর পূর্ণ করেছে। একটি অবৈধ, অগণতান্ত্রিক, ভোটারদের অংশগ্রহণবিহীন নির্বাচন করে, দেশের মধ্যে চরম ফ্যাসিবাদী শাসন জারি করে ৩ বছর ধরে একতরফাভাবে দেশ চালানোর জন্য তারা গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বে বাহবা পেতেই পারেন। কিন্তু সারাদেশের মানুষ নিদারুণ অবস্থায় মুক্তির রাস্তা খুঁজছে। কেউই ভাল নেই। আজিজ বা সুক্তির কথা পত্রিকায় আসলেও অনেক নাম প্রতিদিন মুছে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, যাদের কথা পত্রিকার পাতায় আসছে না। কিংবা আত্মহত্যা না করলেও করুণ পরিস্থিতিতে জীবন কাটাচ্ছেন দেশের অনেক সাধারণ মানুষ যাদের মরা কিংবা বেঁচে থাকার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ আজ সংকটজনক অবস্থার মধ্যে আছেন

রাস্তাঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট আর নদীর উপর বড় সেতু বানানোটাকেই যারা উন্নয়ন মনে করেন, সেরকম পরিত্যাজ্য বিজ্ঞ লোক ব্যতীত আর সবাই এই সময়ের প্রতিটি দিনকে হাতে গুণতে পারবেন। শুধু গত দুই বছরেই বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানিসহ অন্যান্য সেবাখাতগুলোর মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ৬৮%। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ঢাকা শহরে বাড়িভাড়া বেড়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ। গত দশ বছরে বেড়েছে সাড়ে চার গুণ। গরীব-নিম্নবিত্ত মানুষ যারা ঢাকা শহরে সামান্য কাজ করে কোনরকমে পরিবার প্রতিপালন করেন, তাদের জীবন টেনে নেয়াই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এ চিত্র বিভিন্ন মাত্রায় দেশের সবগুলো জেলায়। জেলা শহরগুলো সাধারণত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা শহরে এসে ভীড় জমায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য। শহরাঞ্চলে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি ও জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাবে শিক্ষা ব্যয় বেড়ে গেছে অনেকগুণ। আবার সরকারি শিক্ষা *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অধিকার বঞ্চিত মানুষের আকুতির প্রকাশ ঘটেছে সুন্দরবন রক্ষার হরতালে

গত ২৬ জানুয়ারি ঢাকার শাহবাগ এলাকার দৃশ্য যারা দেখেছেন, তাদের কাছে মনে হবে - এ যেন রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্র! যুদ্ধ তো হয় দু'পক্ষে। কিন্তু এতো একপাক্ষিক যুদ্ধ। যাদের দিকে তাক করে মুহুর্মুহু রাবার বুলেট, টিয়ারশেল, জলকামান দাগানো হচ্ছে, তাদেরই ট্যাক্সের পয়সায় এসব কেনা হয়েছে। এমনকি বেঁচে থাকার মাসিক খরপোষের জোগানও তারাই দেয়। জনগণের নিমক খাওয়া পুলিশের হাত ও চেতনা – দুই-ই শাসকের ইচ্ছাধীন। তা না হলে সহযোদ্ধার গায়ে রাবার বুলেট লাগার আক্রোশে জলকামানে চেপে বসা মিজানুরের গায়ে সদলবলে হামলে পড়ার আগে থমকে গিয়ে একবার ভাবত – নিরস্ত্র কেউ আক্রমণ করতে যায় না! অবশ্য অগ্রপশ্চাৎ ভাবার উপায়ও নেই; কেননা এরা তো হুকুমের তাবেদার। আর যারা হুকুমদার তাদের একটাই কথা – তারা যাকে উন্নয়ন বলবে, তা ক্ষতিকর হলেও প্রশ্ন তোলা যাবে না।

দীর্ঘ ৭ বছর ধরে প্রতিবাদের বহু কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায় ঢাকায় অর্ধবেলা হরতাল ডেকেছিল জাতীয় স্বার্থে 'তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি'। দাবি ছিল– সুন্দরবন বিনাশী রামপাল বিদ্যুৎপ্রকল্পসহ সকল বাণিজ্যিক অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। ভোর ৬টাতেই রাজধানীর পল্টন, শাহবাগ, আজিমপুর, সূত্রাপুর, মিরপুর, সায়েন্সল্যাব, তেজগাঁসহ বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয় বাসদ(মার্কসবাদী)সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উন্নয়নের শোরগোলে চাপা পড়ছে মানুষের আর্তনাদ

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ কয় বছরে ব্যাপকহারে বেতন ও অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তো করা হচ্ছেই। শিক্ষাখাত প্রায় পুরোপুরি বেসরকারিকরণ হচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) এর মাধ্যমে চলছে।

কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। এ সরকারের আমলে কোন বছরই কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম উঠাতে পারেনি। ব্র্যাকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দেশে প্রায় ৫০ শতাংশ মাঝারি মানের ও ৩৯ শতাংশ প্রান্তিক কৃষক রয়েছেন। প্রচলিত ভর্তুকি ব্যবস্থায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা অবহেলিত ও বঞ্চিত থাকেন, কেননা ভর্তুকি বন্টনে বর্তমানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে বড় বড় কৃষকরা এবং সার-কীটনাশক ব্যবসায়ীরা লাভবান হন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা তখন বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নেয়। পরপর কয়েক বছর চাষের ক্ষতি হলে এই কৃষকরা আর টিকে থাকতে পারেন না। ২০১০ সাল থেকে হিসাব করা হলেও দেখানো যাবে যে, মহাজোট সরকারের এ কয় বছরে কত ব্যাপক সংখ্যক কৃষক ঘরবাড়ি সব বিক্রি করে শহরে এসেছে।

এদেশে শ্রমিকরা কি অবস্থায় আছে তা বলে বুঝানোর দরকার নেই। বর্তমান সরকারের সময়ে তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছে প্রায় দেড়শত শ্রমিক। রানা প্লাজা ধ্বসে নিহত হয়েছে প্রায় ১২০০ এর অধিক শ্রমিক। শত শত লোক পঙ্গু হয়ে গেছে। কারো বিচার হয়নি। শ্রমিকরা থেকে থেকেই বিক্ষোভ করছে একটা মানসম্মত ন্যূনতম মজুরির জন্য। কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। অমানুষিক পরিশ্রম ও অত্যধিক নিম্ন মজুরির বিনিময়ে দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পখাত, গার্মেন্টস্ খাত চলছে। বিশ্ব বাজারে পোশাক রপ্তানীতে একবার চীনকেও ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ, আর সেটা হয়েছে অত্যধিক নিম্ন মজুরি সুবিধার কারণে। দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক - প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক এই খাতে যুক্ত। এই ডিসেম্বরে আশুলিয়ার উইন্ডি গার্মেন্টসে মজুরীর বিষয় নিয়ে ১১ ডিসেম্বর থেকে গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের আন্দোলন শুরু হয়। ২০১৩ সালে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ৫৩০০ টাকা নির্ধারণের পর ৩ বছর পার হয়ে গেল। এখনো সারা দেশের অনেক কারখানায় মজুরী বোর্ড ঘোষিত এই ন্যূনতম মজুরী কার্যকর করা হয়নি। এই বিষয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলো বারবার সরকার ও মালিক পক্ষকে অবহিত করলেও তাদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আশুলিয়ার উইন্ডি গার্মেন্টসেও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ৫৩০০ টাকা না দিয়ে ৩৮০০ টাকা, সর্বোচ্চ ৪২০০ টাকা দেয়া হতো। এই অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। শ্রমিকরা মজুরি বাড়ানোর দাবি করেছিলো। পাশাপাশি বাৎসরিক ছুটির টাকা প্রদানের দাবি করেছিল কয়েকটি কারখানার শ্রমিক। কারখানাগুলোতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধেও শ্রমিকদের ক্ষোভ ছিল। এবার আশুলিয়ার শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ মিছিল-সমাবেশে তাদের দাবি উত্থাপন করেছিলো- সর্বনিম্ন বেতন ৫ হাজার ৩০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৬ হাজার টাকা করা, কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুপুরে খাবার ও যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি, ছুটির দিনে ওভার টাইম বিল দ্বিগুণ করা, যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা, কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু হলে চাকরির বয়স পর্যন্ত আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ, তাজরীনসহ সব কারখানায় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করা, শিল্পাঞ্চলে সরকারি স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

অথচ এসকল দাবির একটিও না মেনে মালিকদের সংগঠন 'বিজিএমইএ' আশুলিয়ার ৫৯টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিলো এবং শ্রমিকদের জানিয়ে দিলো যে, কারখানা বন্ধ থাকাকালীন সময়ের বেতন-ভাতা তারা পাবে না। আমরা দেখেছি, কারখানা বন্ধ রাখলে তার যে ক্ষতি হয় তা মালিকরা সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নেন। পূর্বেও বিএনপি-জামাতের অবরোধের সময়ে হওয়া আর্থিক ক্ষতি বিভিন্নভাবে মালিকরা সরকারের কাছ থেকে আদায় করেছেন। প্রথম আলোর ২০১৫ সালের করা একটা রিপোর্ট বলছে, গত পাঁচ বছরে মালিকেরা সরকার থেকে নগদ সাহায্য পেয়েছে প্রায় চার হাজার ২১৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট বলছে, ২০১৩ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো সবমিলিয়ে মোট ১১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে গার্মেন্টস শিল্পকে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক একাই ঋণ দিয়েছে ৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের রিপোর্ট বলছে, ২০০৮ এর পরে ২৭০টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ঋণ মওকুফ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর রাষ্ট্রীয় ৮ ব্যাংকের মোট খেলাপী ঋণের ১৬.৭০ শতাংশ আটকে আছে গার্মেন্টস মালিকদের কাছে। অথচ স্বাভাবিক সাধারণ কতগুলো দাবিকে সামনে আনতেই এই শ্রমিকদের উপর কি রূপ নৃশংস আচরণ করলো মালিকপক্ষ ও তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা? শুধু কারখানা বন্ধ নয়, শ্রমিকদের থাকার জায়গাগুলোতে পুলিশ ও মালিকদের পোষা গুণ্ডাদেরকে লেলিয়ে দেয়া হলো। শ্রমিক নেতাদের বিনা নোটিশে গ্রেফতার করা হলো।

এই চিত্র সবগুলো ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যসহ অন্য যে কোন ক্ষেত্রের দিকে তাকালেই এই ভয়ঙ্কর চিত্র চোখে পড়বে।

এসবের মধ্যেই এই সরকার বারবার ঘোষণা করে যাচ্ছে – দেশে উন্নয়ন হচ্ছে। গণতন্ত্র একবারেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু উন্নয়ন করতে গেলে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়! স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে এই দেশে এখন নেই- এ কথা অস্বীকার করার উপায় সরকারেরও নেই। তাই তারা এবারে অন্যরকম গণতন্ত্রের শ্লোগান তুলেছেন। এর নাম 'উন্নয়নের গণতন্ত্র'। সরকারি প্রতিষ্ঠানে, রাস্তায়, দেয়ালে দেয়ালে বিলবোর্ড দিয়ে এই শ্লোগান এখন ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে।

ফ্যাসীবাদ যে কোন ধরনের নগ্ন একনায়কত্ব, এমনকি মিলিটারি ডিকটেটরশীপ বা সামরিক একনায়কত্ব থেকেও অনেক বেশি মারাত্মক

আওয়ামী লীগ সরকার যে ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসন চালাচ্ছে, তা এই দেশের মানুষের কাছে নতুন হলেও বিশ্বের ইতিহাসে এসব জিনিস নতুন নয়। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চরম সংকটের মধ্যে পড়ে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। আওয়ামী লীগ এমন এক সময়ে এদেশে ক্ষমতায় এসেছে যখন পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট বাংলাদেশে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিলো, ছোট-মাঝারি পুঁজিপতি-মধ্যবিত্ত চাকুরি জীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়- এদের মধ্যে নতুন আশাপূরণ তো হয়ই নি, বরং পুরনো জীবনযাত্রার মধ্যেও যতটুকু নিরাপত্তাবোধ ছিলো তাও ধ্বসে গিয়েছিলো। দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থায় পরস্পর সংঘাতময় রাজনীতির কারণে নিয়মতান্ত্রিক সরকার পরিবর্তনও সম্ভব হচ্ছিলো না। বড় দু'দলের উপরেই মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলো। দেশের রাজনীতি সব সময়েই একটা অনিশ্চয়তা-সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। এসকল প্রেক্ষিতে সমস্যা মীমাংসা করতে না পারার কারণে সেনাসমর্থিত যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছিলো সেও মানুষের কাছে ক্রমশ অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো।

একই সময়ে বিশ্বপুঁজিবাদ সংকটে পড়ে তার কল-কারখানাগুলোকে তুলনামূলক সস্তা শ্রমের দেশগুলোতে স্থানান্তরিত করছে। আউটসোর্সিং বাংলাদেশে নতুন একটা সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। দেশের পুঁজিপতিরা চাইছিলো এই সস্তা শ্রম কাজে লাগাতে। কর্পোরেটদের সাথে মিলে কোলাবোরেশনে ব্যবসা করতে। এজন্য তাদের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার দরকার ছিলো। দরকার ছিলো সবকিছুর উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের। বিরোধী দলকে একচেটিয়া দমন ও সকল ক্ষেত্রে বিগ বিজনেস হাউজের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ৫ জানুয়ারির নির্বাচন ও দ্বিতীয় দফায় আওয়ামী লীগকে নিয়ে আসা দরকার ছিলো। এ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে, অথচ প্রচলিত আইনসম্মত ব্যবস্থায় (বাস্তবে তা ন্যায়সঙ্গত নয়, আইনের মূল চেতনার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়) পুনরায় ৫ বছরের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক একনায়কত্ব একটা রূপে হয়, তাকে বোঝা যায়, কিন্তু এ ধরনের শাসন জনগণকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে। যেহেতু প্রকাশ্যেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতির লঙ্ঘন হয়েছে, তাই শেখ হাসিনা প্রথমে বলেন যে, নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময় চলে আসার কারণে সংবিধান রক্ষা করার জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে। পরবর্তীতে সকল দলের অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ক্রমেই সেই অবস্থান থেকে তারা সরে এলেন। কারণ বিএনপি-জামাত কোনরকম আন্দোলনের শক্তি হিসেবে মানুষের সামনে আসতে পারেনি। জনগণের সমস্যা-সংকট নিয়ে এই দুই দল কখনই রাস্তায় নামেনি। উপরন্তু ক্ষমতায় থাকাকালে তারাও সেই পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষা করেই চলেছে। তারাও তাদেরই শ্রেণীস্বার্থরক্ষাকারী দল। এখন দেশের বড় বিজনেস হাউসগুলো তাদেরকে চাইছে না। চাইছে আওয়ামী লীগকে। কারণ আওয়ামী লীগকে দিয়ে একইসাথে প্রগতিশীলতা ও ধর্মের ঝাণ্ডা বহন করানো যায়। জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে মানুষকে উত্তেজিত করা যায়। কি ধর্মান্ধ, কি ধর্মবিরোধী সবার মধ্যেই একটা উগ্রতা সৃষ্টি করে গোটা দেশে যুক্তি-তর্ক করার পরিবেশকেই মেরে দেয়া যায়। এই অবস্থা যে কোন দেশে ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলার পূর্বশর্ত। ফলে বিএনপি-জামায়াত কোন প্রকার প্রতিরোধের শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারলো না। আবার তাদের র‍্যাঙ্ক ও ফাইল এমনভাবে প্যাটার্ন যে, ক্ষমতা দখলের আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনরকম গণতান্ত্রিক আন্দোলনেই তাদের আগ্রহ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, চেষ্টাও নেই। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারের ভয়াবহ আক্রমণে তাদের শত শত নেতা-কর্মী গ্রেফতার, গুম, খুন হয়ে যাওয়ায় এবং বিরাট সংখ্যক নেতা-কর্মীদের নামে একাধিক করে মামলা থাকায় তারা একভাবে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আর দেশের বাম গণতান্ত্রিক শক্তি, যারা দেশে সত্যিকার অর্থেই শোষিত সাধারণ মানুষের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু তাদের শক্তিহীনতা, গণবিচ্ছিন্নতা ও অনেক বামপন্থী দলের সঠিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এ আন্দোলন গড়ে উঠতে দিলো না।

কিন্তু মানুষের ক্ষুব্ধতা তাই বলে কমেনি। এবার আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদের চিরাচরিত অস্ত্র, যা দুনিয়ার সকল ফ্যাসিস্ট সরকারই ব্যবহার করেছেন বা করেন, তা ব্যবহার করা শুরু করলো। তা হলো উন্নয়নের গালভরা কথা। আর এজন্য শ্লোগানটাও তারা নির্ধারণ করলো চমৎকার- "উন্নয়নের গণতন্ত্র"!

উন্নয়নের প্রচারটা জনগণের ভালভাবে বোঝা দরকার

দেশে বিরাট উন্নয়ন হচ্ছে এমন খবর প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যাচ্ছে। মেগা প্রকল্পগুলোর ছবি ও সংবাদ জনগণের কাছে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। কিছু তথ্যও প্রদর্শিত হচ্ছে, যেমন- পুঁজিবাদী বিশ্বের চরম সংকটের এ সময়েও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। এসবকে উন্নয়ন বলে ধরেন এমন কিছু লোকও এদেশে আছেন। দেশের এক বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এগুলোকে ফলাও প্রচার করে মানুষের সামনে এমনভাবে আনছেন, যাতে তাদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিবিমুখ এক বড় সংখ্যার মানুষ এর দ্বারা বিভ্রান্তও হচ্ছেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে যে দলই ক্ষমতায় আসুক, দুর্নীতি-লুটপাট-রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন-বিচারহীনতা এসব থাকবেই- এটা অনেকেই মনে করেন। দু'দলের বিগত সময়ের কর্মকাণ্ডে, এমনকি গোটা বিশ্বে বুর্জোয়া রাজনীতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে যে কোন সচেতন-শিক্ষিত লোকই এই সিদ্ধান্তে আসবেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সঠিক সংগ্রাম পরিচালনা করার রাজনৈতিক শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ার কারণে এটাকেই মানতে হবে এরকম একটি অসহায় মননও কিছু মানুষের গড়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে মন্দের ভালো; লুট করলেও তো তারা কিছু দিচ্ছে কিংবা একহাতে দেশটাকে সামলাচ্ছে না হলে জঙ্গিরা টিকতে দিত না – ইত্যাদি কথাও এই বিভ্রান্তির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে, যা বাস্তবে, তারা বুঝুন আর নাই বুঝুন, ফ্যাসিবাদী শাসনকেই স্থায়িত্ব দিতে সাহায্য করছে।

দেশে কি কোন কাজের ক্ষেত্রই তৈরি হয়নি? কোন উন্নয়নই কি দেশের হয়নি? কিছু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এটা ঠিক, এটা ফলাও করে দেখানোও হচ্ছে, কিন্তু পাশাপাশি এও দেখা উচিত যে কত লোক কর্মসংস্থান থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন। তবেই দেশের আসল চিত্র বেরিয়ে আসবে। পাঠকরা আলোচনার শুরুতে দেয়া পরিসংখ্যান থেকেই তা কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। আবার এই যে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে, এই কাজের ক্ষেত্রটা কী? দেশে প্রচুর বড় বড় প্রজেক্ট নেয়া হয়েছে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য। স্যামসাং থেকে শুরু করে বড় বড় কর্পোরেটেরা সস্তা শ্রম, সস্তা কাঁচামাল, সস্তায় গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি পাচ্ছে বলে এখানে তাদের ফ্যাক্টরি শিফ্‌ট করছে। তাদের জন্য 'স্পেশাল ইকনোমিক জোন' তৈরি করা হচ্ছে। ভারত, চীন, জাপান *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

যে দেশে মানুষ বড়

জসীম উদ্‌দীন

(জসীম উদদীন, স্বনামখ্যাত কবি। যিনি আমাদের দেশে পল্লীকবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের আমন্ত্রণে ১৯৬৮ সালে তিনি সে দেশে সফরে যান। রাশিয়ায় ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন 'যে দেশে মানুষ বড়' বইয়ে। এবছর সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে উপলক্ষে আমরা ধারাবাহিকভাবে মনীষীদের লেখা প্রকাশ করছি। এসংখ্যায় জসীম উদ্‌দীনের বই থেকে নির্বাচিত অংশ আমরা ছাপালাম।)

আমি সারা জীবন আমার দেশের জনগণকে লইয়া সাহিত্য করিয়াছি। তাহাদের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা, ভালবাসা লইয়া কবিতা লিখিয়াছি, নাটক লিখিয়াছি, উপন্যাস লিখিয়াছি। আমার খুব বড় স্বপ্ন ছিল একবার সোভিয়েত দেশে যাইব। সে দেশের রাষ্ট্র কিভাবে তার জনগণকে সব চাইতে বড় আসন দিয়াছে, কিভাবে মূক জনগণকে তার আজীবনের কুসংস্কার, অন্ধগোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতা হইতে মুক্ত করিয়া উপরে তুলিয়া ধরিয়াছে সেই দৃশ্য নিজের চোখে দেখিয়া আসিব। আরও শুনিব সেই উৎসর্গিত-প্রাণ মহামানবদের কথা যাঁহারা তিলে তিলে জীবন দান করিয়া দেশের অগণিত মানুষগুলিকে পীড়নের আর শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।...কিছুদিন মস্কো শহরে ঘুরিয়া একদিন বিকালে লেনিনগ্রাডে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই সেই লেনিনগ্রাড, যার নগর প্রান্তে দুর্ধর্ষ জার্মান অভিযান প্রতিহত হইয়াছিল। জীবনদানের এই সেই মহাযজ্ঞভূমি। ভয়কে এদেশের লোক তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল তাই ভয় ইহাদের ভয়ে পালাইয়াছিল। মৃত্যুকে ইহারা মানে নাই। তাই মৃত্যুকে ইহারা জয় করিতে পারিয়াছিল।

লেনিনগ্রাডে আসিয়া প্রথমেই আমার পরিচালককে বলিলাম, 'স্বাধীনতাকামীর চির-তীর্থভূমি আমাকে সেইখানটিতে লইয়া চলুন, যেখানে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আপনাদের দেশের বীর-পুত্রেরা জন্মভূমির জন্য জীবনদান করিতে আসিয়াছিলেন। নানাপথ ঘুরিয়া আমাদের গাড়ি সেই স্থানটিতে আসিয়া পৌঁছিল। একটি ট্যাঙ্ক রাখিয়া স্থানটি চিহ্নিত করা হইয়াছে। ডানদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। বামধারে একটি পার্ক। ট্যাঙ্কের পাশে কয়েকখানা টুল পাতা। তারই একখানায় বসিয়া মানস নয়নে আঁকিতে লাগিলাম এই মহা কাহিনীর ইতিহাস। যে দুর্ধর্ষ জার্মান-বাহিনীকে ফ্রান্স, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া প্রতিরোধ করিতে পারিল না। কত লৌহ দেয়াল পদাঘাতে তাহারা বিচূর্ণ করিয়া দিয়া আসিল; কত পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র যাহাদের পথ রুদ্ধ করিতে পারিল না, এখানকার মানবদেহের দেয়াল তাহারা ডিঙাইতে পারিল না। মানস নয়নে আমি যেন দেখিতে পাইলাম, দলে দলে বীর সেনানীরা এখানে আসিয়া জীবনদান করিয়া যাইতেছে – একদল শেষ না হইতেই আর একদল এখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে – পাথরের দেয়াল ভাঙ্গিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু মানবদেহের দেয়াল ভাঙ্গিলে আবার গড়িয়া উঠে। মানস নয়নে যেন দেখিতে পাইতেছি কত মাতা সন্তানকে শেষ চুম্বন দিয়া বিদায় দিতেছে, কত বধূ তার দয়িতকে বীরের মতো সাজাইয়া এখানে পাঠাইতেছে, কত পিতা, কত পুত্র, কত বন্ধু, কত আত্মীয় আপনার প্রিয়জনকে হাসি মুখে এই মরণযজ্ঞে পাঠাইয়া দিতেছে। এ কোন্ মমতা – এক কোন্ প্রেম! ভাবিতে ভাবিতে দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়। ওরা দেখিয়া যাইতে পারে নাই, ওদের আত্মদানে দেশের কোন্ শুভ আসিয়াছে, ওরা ভাবিয়াছিল আমরা মরিয়া যদি যাই দেশের অনাগত ভাই-বোনেরা দাসত্বে শৃঙ্খল গলায় পরিবে না – এই পৃথিবীকে তাহারা আবার নতুন করিয়া গড়িয়া লইবে। ওদের জয়ে শুধু রুশিয়ারই জয় হইবে না, রাশিয়ার সাম্যবাদের নতুন জয় হইবে। এই মন্ত্র রাশিয়ার চৌহদ্দী ডিঙাইয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। যেখানে মানুষ আজও পর পীড়নের আঘাতে জর্জরিত, শোষকের কারাগারে মানবতা, দয়া-প্রেম অবলুণ্ঠিত সেখানে শান্তির বাণী বহিয়া আনিবে। এই ময়দানে বসিয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়া আসিল। কী মহান মৃত্যু – কী মহান আত্মত্যাগ। পৃথিবী মাতা এখানেই তার আদরের সন্তানদিগকে আঁধারের আবরণে জড়াইয়া লইলেন। এই মহান ঘুমের আবহাওয়াকে আপনার অস্তিত্ব দিয়া আর ব্যাঘাত করিতে চাহিলাম না। ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম।

...এখান হইতে গেলাম লেনিনের স্মৃতি-মিউজিয়াম দেখিতে। এখানেই লেনিন তাঁহার বিপ্লবের কাজ আরম্ভ করেন। যে চেয়ারে বসিয়া, যে টেবিলখানি সামনে রাখিয়া মহামতি লেনিন লেখাপড়া করিতেন, যে বিছানায় তিনি শয়ন করিতেন, তাঁর কাগজ কলম, আসবাবপত্র সকলই তাঁর জীবিতকালে যেখানে যেমন ছিল তেমনই আছে। বিভিন্ন সময়ে তাঁর কথা, আদেশপত্র, চিঠি সবই গ্লাস-কেসে রহিয়াছে; তাহা ছাড়া ঘরের দেয়ালে লেনিনের জীবনের কয়েকটি ঘটনা চিত্রিত আছে। বিপ্লবের পর রুশে দেশে একটি সামরিক গভর্নমেন্ট তৈরি হয়। এই গভর্নমেন্ট ধনিকদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করিয়া চলিতেছিল। এই ঘর হইতেই লেনিন তাঁর অনুগামীদের সেই সামরিক গভর্নমেন্ট ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করেন। সে দৃশ্যও দেয়ালে আঁকা রহিয়াছে। এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে কেবলই মনে হইতেছিল, এই বিরাট পুরুষ, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে শত শত যুবক মৃত্যুকে অবহেলা করিত, কী সাধারণ, কী সহজ ছিল তাঁর স্বকীয় জীবনযাপন! এই মহামানুষ মরিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকে কেহ বাধা দিতে পারেন না। কিন্তু সমস্ত সোভিয়েত ভরিয়া নানা ছবিতে, মূর্তিতে জীবনালেখ্য তাঁহাকে সমগ্র জাতির চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে এদেশের রাষ্ট্র কোন রকমের প্রকাশ-ভঙ্গিকেই অবহেলা করেন নাই।...বিকালে ৭-৩০মিনিটে গেলাম এখানকার মালি অপেরা ও ব্যালে থিয়েটারের একটি নৃত্যনাট্য দেখিতে। ইবসেনের সালবেগ নাটকের গল্পাংশ অবলম্বন করিয়া এই নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছে। চীন দেশের মতো বর্তমান কালের রাশিয়া তার সাহিত্যকলাকে শুধু প্রচারযন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করিতেছে না, এ দেশের লেখকেরা সাহিত্যবিভাগের নানা দিগন্তে বসিয়া এক একজন এক এক রকমের সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছে।...মানব মনের যতগুলি প্রকাশের পথ আছে সোভিয়েত গভর্নমেন্ট তার সবগুলি দরজাই শুধু খুলিয়া দেন নাই, জনগণ যাহাতে সেই পথে আগাইতে পারে রাষ্ট্র সে জন্যও কম সতর্ক নয়। সোভিয়েত দেশের নৃত্যকলা যাহা বিশ্বের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে, কোন দেশের নৃত্যকলাই এদের মতো জনগণের স্বীকৃতি পায় নাই।...

আরও বহুপথ এই পাইন বনের মধ্যে ঘুরিয়া আমাদের গন্তব্যস্থান পায়নিয়র কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ফিরিবার পথে অনেক কথা ভাবিতে লাগিলাম। দেশের রাষ্ট্র সব চাইতে জোর দেয় তার ভবিষৎ নাগরিকদের সংগঠনে। দুই বছর বয়স হইতেই তাহাদের শিক্ষাকার্য আরম্ভ হয়। নানা রঙের ছবি দেখাইয়া, নাচ শিখাইয়া, গান শিখাইয়া, বহু রকমের গল্প বলিয়া সুদক্ষ শিক্ষয়িত্রীদের হাতে শিশুদের প্রথম ছয়টি বৎসর কাটে। তারপর ছোটরা যায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। সেখানে যাইয়া তাহারা বই পুস্তকের শিক্ষা আরম্ভ করে। বিগত বৎসর ছবি দেখিয়া, গান শিখিয়া, গল্প শুনিয়া, দেশের ইতিহাস ভূগোলের অনেক কিছু তাহারা শিখিয়া আসিয়াছে। তাহাদের অজ্ঞাতে কখন যে বর্ণমালা শিখিয়া আসিয়াছে শিশুরাও জানে না। আট বৎসর ধরিয়া তাহারা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করে। সপ্তম বৎসরে শিক্ষকেরা অনুসন্ধান করেন স্কুলের শেষ করিয়া কোন্ শিশু কোন্ বিদ্যা শিখিতে চায়। যেসব শিশু বিজ্ঞান বিভাগে যাইতে চাহে তাহাদের প্রধান শিক্ষক আলাদা করিয়া রাখেন। প্রধান শিক্ষকের নির্দেশমতো বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আসিয়া তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহারা বিজ্ঞান পড়িবার উপযুক্ত কিনা তাহা জানিয়া লন। পরে তাঁহাদের মনোনীত ছাত্ররাই শুধু বিজ্ঞান পড়িবার সুযোগ পাইয়া থাকে। এইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে, ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রে, উড়োজাহাজ নির্মাণে, উড়োজাহাজ চালনায় নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞরা আসিয়া স্ব স্ব বিভাগের ছাত্র নির্বাচন করিয়া যান। বিশেষজ্ঞরা যেসব ছাত্রকে নির্বাচন করেন না, তাহারা বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিবার উপযুক্ত হইতে আরও কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করে। শিশুকাল হইতে সর্বোচ্চ শিক্ষাসোপান পর্যন্ত কোন ছাত্রকেই বেতন দিতে হয় না। তাহাদের বই পুস্তকের ব্যয়ভার সরকারই বহন করেন। সুবিস্তীর্ণ সোভিয়ত দেশ জুড়িয়া বহু রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাল পাতা। শিশুকাল হইতেই শিশু যাহাতে কোন মিথ্যা কুসংস্কার বা অন্ধগোঁড়ামি শিক্ষা না করে তাহার পাঠ্য বইগুলিতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তেমনি নিবন্ধাবলী রচনা করা হয়। আমাদের দেশে যেমন শিশুরা ইতিহাসের ক্লাশে বাবা আদমের কাহিনী হইতে মানুষের জন্মবৃত্তান্তের ঘটনা শিখিতে আরম্ভ করে, আবার বিজ্ঞানের ক্লাশে যাইয়া ইভোলিউশনের থিউরী শিখিয়া দুই বিপরীত ঘটনা লইয়া মুশকিলে পড়ে, এদেশের শিক্ষায় তেমন হইতে পারে না। বিজ্ঞানের গবেষণা-যন্ত্রে যে তথ্য টেকে না তাহা সোভিয়েত দেশ বিশ্বাস করে না। ছাত্রদিগকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয় না।...

লেনিনগ্রাডে থাকিতে একদিন গেলাম সেখানকার একটি সমবায় ফার্ম দেখিতে। নানা পথ ঘুরিয়া খামার গেটে যাইয়া উপস্থিত হইলে কৃষি খামারের চেয়ারম্যান আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এইখানে একটি নাট্যশালা আছে। সেখানে এখানকার শ্রমিকেরা মাঝে মাঝে অভিনয় করেন। বর্তমানে যারা ভাল গাইয়ে, নাচিয়ে তারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে নাচগান করিতে। সুতরাং এখানে কোন গান শোনার বা নাচ দেখার সুযোগ হইল না। এই ফার্মে কত লোক কাজ করে, কি কি ফসল উৎপাদন করিতে এই ফার্ম কতটা উন্নতি করিয়াছে তাহার একটি ফিরিস্তি দিয়া এই নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমেরিকায় দেখিয়াছি এক বৎসর অন্তর চাষের জমিকে পতিত ফেলিয়া রাখা হয়। তাতে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। সোভিয়েত দেশে জমির অভাব নাই। তবু এ দেশের জমি এক বৎসরের জন্য পতিত ফেলিয়া রাখা হয় না। খামার সংলগ্ন ল্যাবরেটরীতে জমির মাটি পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞরা বলিয়া দেন, পরবর্তী বৎসরে জমিতে কি কি সার ব্যবহার করিতে হইবে। সেই অনুসারে সার ফেলিয়া প্রতি বৎসরই ইহারা প্রচুর শস্য লাভ করে।

এদেশে শস্যে কীটপোকার উপদ্রব হইতে পারে না। কারণ শস্য-ক্ষেতের আশেপাশে যত আগাছা জন্মে তাহাতেই কীটপতঙ্গের জন্ম হয়। তাই আশেপাশের যত আগাছাগুলিকে কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হয়। জমিতে শস্য বপনের সময় কীটনাশক কিছুটা ঔষধ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে ক্ষেতে কীট পোকার উপদ্রব হয় না। আমাদের দেশের কীটনাশক বিশেষজ্ঞদের মতো আগে জমিতে কীটপোকার অবাধ বংশবিস্তারের সুযোগ দিয়া পরে স্থানে স্থানে কীটনাশক ঔষধ ছড়াইয়া গরু এবং মানুষের জীবন বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলে না। জমিতে বীজ বুনিতে ইহারা সবচাইতে ভাল ফসলের বীজ সংগ্রহ করিয়া লয়। ভাল বীজ উৎপন্ন করিতে এদেশের কত গবেষণা। ফসল উৎপাদনে কাহারও গাফিলতি এদেশের রাষ্ট্র সহ্য করে না।এমন যে দুর্দণ্ড প্রতাপ ক্রুশ্চেভ, তাঁকেও ক্ষমতা হইতে সরিয়া যাইতে হইল, তাহার প্রধান কারণ তাঁর আমলে সোভিয়েত দেশে ভালমতো ফসল উৎপন্ন হয় নাই।

লেনিন যখন প্রথম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, দেশবাসীর প্রতি তার প্রধান উপদেশ ছিল দেশের বিদ্যুৎশক্তি বাড়াও আর সকলকে শিক্ষা দাও। বিদ্যুৎশক্তি বাড়াইলে দেশের অসংখ্য মিলগুলিতে বহু কলকব্জা আর শিল্পজাত সামগ্রীই তৈরি হইবে না, বিদ্যুৎশক্তির বলে সর্বত্র জলপ্রবাহ বহাইয়া সমস্ত দেশকে শস্য সম্পদে ভরিয়া তুলিবে। আজ রুশ দেশ বিদ্যুৎশক্তিতে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।...পথে আসিতে আসিতে চেয়ারম্যান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার বাগানে এত ফল পাকিয়া আছে, চোরে চুরি করিয়া লয় না?' তিনি বলিলেন, 'প্রত্যেকের বাড়িতেই কত ফল ফলিয়া আছে। কে কত খাইবে। কেউ চুরি করে না।' এখানে সমবায় কৃষি ফার্ম হওয়ার আগে চেয়ারম্যান সাহেবের বাবা এদেশের একজন বর্ধিষ্ণু কৃষাণ ছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ একরের মতো জমি ছিল। কিন্তু সে জমিতে জলসেচন ও সার প্রয়োগের অভাবে তেমন ভাল ফসল হইত না। এখন জমি কৃষি খামারকে দিয়া তিনি সুখেই আছেন। কৃষি খামার হইতে বিদায় লইয়া শহরে ফিরিয়া চলিলাম। পথের দুই পাশে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য; *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সারাদেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে গণভোট

সরকার কোথায় আছে, আর জনমত কী বলছে?

ইডেন কলেজ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার উদ্যোগে গত ১-৮ ডিসেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ডিসেম্বর কলেজের ১ নং গেইটে গণরায় ঘোষণা করা হয়। রায় ঘোষণা করেন তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। ৪১৩৮টি ভোটের মধ্যে সুন্দরবনের পক্ষে ভোট পড়ে ৪০২৫টি আর রামপালের পক্ষে ৯টি। কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক তৌফিকা লিজার সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য ফখরুদ্দিন কবির আতিক, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সহ-সভাপতি এডভোকেট সুলতানা আক্তার রুবি, ব্যারিস্টার সাদিয়া আরমান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা ও ঢাকা নগর শাখার সভাপতি মাসুদ রানা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কলেজ কমিটির সদস্য লুবাইনা আন্নি।

কারমাইকেল কলেজ

রংপুরে কারমাইকেল কলেজে অনুষ্ঠিত প্রতীকী গণভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গতকাল ২১ জানুয়ারি। কারমাইকেল কলেজে ৪৩৮৩ ভোটের মধ্যে সুন্দরবনের পক্ষে পড়ে ৪১৫৩টি, রামপালের পক্ষে ১৯৮টি এবং ৩২টি ভোট বাতিল হয়। কারমাইকেল কলেজে ৯৪.৭৫% শিক্ষার্থী রামপাল চুক্তি বাতিলের পক্ষে ভোট দেয় এবং সুন্দরবনের বিপক্ষে ভোট পড়ে ৪.৫২%।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণকারী ২০২৩ জন ভোটারের মধ্যে সুন্দরবনের পক্ষে ১৮৮০টি, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষে ১৬৫টি এবং ১২টি ভোট পরিত্যক্ত হয়। শতকরা ৯১.৩০ ভাগ সুন্দরবনের পক্ষে এবং ৮.১১ ভাগ রামপালের পক্ষে মত দেয়।

রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে গণভোটের ফলাফল প্রকাশ করেন কারমাইকেল কলেজের সাবেক ভাইস-প্রিন্সিপাল অধ্যাপক সাহারা ফেরদৌস। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু। বাসদ(মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু, লেখক ও গবেষক ড.মিজানুর রহমান, রংপুর বিভাগ উন্নয়ন পরিষদের আহ্বায়ক ওয়াদুদ আলী, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর হোসেন চাঁদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পাঠাগার সম্পাদক আবু রায়হান বকসী, কারমাইকেল কলেজ সভাপতি হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিড, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এদিকে গত ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্দরবন নিয়ে গণভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯১.৯০ শতাংশ অর্থাৎ ৪৭৭৭ জন শিক্ষার্থী সুন্দরবনের পক্ষে মত দিয়েছে। আর রামপালের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৯২টি অর্থাৎ ৭.৫৪ শতাংশ। ভোট বাতিল হয়েছে ২৯টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে রায় ঘোষণা করেন প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখার সদস্য সচিব অপু দাশ গুপ্ত, গণসংহতি আন্দোলন চট্টগ্রাম জেলার সমন্বয়ক হাসান মারুফ রুমি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সত্যজিৎ বিশ্বাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফজলে রাব্বী।

দিনাজপুর

গত ২৩ জানুয়ারি দিনাজপুর জেলা শাখা আয়োজিত গণভোটের ফলাফল ঘোষিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী ২৪৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ২৩২৫ জন ভোটার অর্থাৎ ৯৩.১১ শতাংশ ভোটার সুন্দরবনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। আর রামপালের পক্ষে ভোট পড়েছে মাত্র ১৪৯ টি। ২২টি ভোট বাতিল হয়েছে।

প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে রায় ঘোষণা করেন তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির নেতা আমিনুল ইসলাম বাবলু। উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী) দিনাজপুর জেলার সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ।

খুলনা

খুলনার হাসিদ পার্কে গত ২০ জানুয়ারি খুলনা জেলা শাখা আয়োজিত গণভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী) খুলনা জেলার সমন্বয়ক বিপ্লব মণ্ডল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও খুলনা জেলার সংগঠক রুহুল আমিন ও পরিচালনা করেন সুজয় সাম্য। এখানে মোট ৩১৬৫টি ভোট সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনের পক্ষে ভোট পড়ে ২৭৯৪টি আর রামপালের পক্ষে ৩৪৪টি।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কুয়েটে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা। এখানে মোট ভোট পড়ে ১২১৫ টি। সুন্দরবনের পক্ষে ১১১২ টি অর্থাৎ ৯১.৫২ শতাংশ ভোট পড়ে। আর রামপালের পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ৯০টি অর্থাৎ ৭.৪১ শতাংশ, ভোট বাতিল হয়েছে ৬টি।

যশোর

গত ৬-১৮ জানুয়ারি যশোরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ জানুয়ারি যশোর জেলার দড়াটানা ভৈরব চত্বরে গণভোটের রায় ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান। উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী) যশোর জেলার সমন্বয়ক হাসিনুর রহমান, অ্যাডভোকেট মাহমুদ হাসান বুলু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু। সভাপতিত্ব করেন উজ্জ্বল বিশ্বাস, পরিচালনা করেন পলাশ পাল।

মোট সংগৃহীত ভোটের (৬৪৪৮টি) ৯১.৬৫ শতাংশ(৫৯১০টি) সুন্দরবনের পক্ষে আর ৭.৩৩শতাংশ(৪৭৩টি) রামপালের পক্ষে। ভোট বাতিল হয়েছে ৬৫টি।

মাস্টারদা সূর্যসেন'র ফাঁসি দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাস্টারদা সূর্যসেন ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর নেতৃত্বে যুববিদ্রোহের মাধ্যমে দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এদেশের যুবসমাজ। তৎকালীন সময়ে যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয় না বলা হত, ঠিক সে সময়ে মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। কিন্তু আজকের দিনে শাসকরা এ ধরণের চরিত্র আমাদের সামনে থেকে মুছে দিতে চায়। সূর্যসেনের মতো চরিত্রদের স্মরণ করার কোনো আয়োজন নেই। একদিন মাস্টারদা যুবসমাজকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছিলেন। কিন্তু আজকে তাদের চরিত্র হরণের মধ্য দিয়ে যুব সমাজকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছে।

১২ জানুয়ারি মাস্টারদা সূর্যসেন'র ৮৩তম ফাঁসি দিবসে বাসদ(মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখা জে এম সেন হলস্থ মাস্টারদা সূর্যসেনের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বক্তারা এসব কথা বলেন। জেলা আহবায়ক কমরেড মানস নন্দী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব কমরেড অপু দাশ গুপ্ত।

আন্দোলনের বিজয়

ভর্তি ক্ষেত্রে চা বাগানের শিক্ষার্থীদের ১০ ভাগ কোটা মানতে বাধ্য হলো প্রশাসন

'ই বার হামদের (আমাদের) ছেলে মেয়ে গুলান ইশকুলে পড়বেক (পড়বে), টাকা নাই লাগবে'- লাক্কাতুরা চা বাগানে সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই চা শ্রমিকদের মধ্যে এই মনোভাব তৈরি হয়েছিল। বুকের নিভৃত কোণে অনেক দিনের চাপা পড়া স্বপ্ন এবার যেন বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু কেতাদুরস্ত স্যুট-টাই পড়া সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বুকে মাত্র ৮৫টাকা মজুরির চা শ্রমিকদের এই স্বপ্ন স্পর্শ করবে কেন?

২৮ নভেম্বর'১৬ স্কুলে ভর্তির সার্কুলার জারি করে প্রশাসন, কিন্তু দেখা গেল অতীতের বহু আশ্বাসের ন্যায় এবারও সেই একই প্রতারণার পথে হাটলো সরকার। চা শ্রমিকদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। তৎক্ষণাৎ আন্দোলনে নামে 'চা বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ', দাবি তোলা হয় ভর্তির ক্ষেত্রে চা বাগানের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার এবং ৪০ ভাগ কোটা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ মাধ্যমিক সরকারি স্কুলে ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালায় ঢাকা শহরের মত জায়গায় ৪০ ভাগ এলাকা কোটা রয়েছে, তবে পশ্চাৎপদ চা বাগানের ক্ষেত্রে কেন নয়? এ সময় চা শ্রমিকদের মনোভাব বুঝা যায় লাক্কাতুরা চা বাগানের ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রের বক্তব্যে, 'আমাদের বুকের উপর স্কুল আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখবো? আমাদের সুযোগ না দিলে স্কুল চালু হবে না"। ৯ ডিসেম্বর স্কুলের সামনে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ। মিছিল সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন আশপাশের বাগানের কয়েকশ চা শ্রমিক।

বাগানে বাগানে সংহতি সমাবেশ এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে মত বিনিময় প্রক্রিয়ায় আন্দোলন আরোও জোরদার হয়ে উঠে। এই আন্দোলন চলতে চলতে ১৭ ডিসেম্বর স্কুলের সম্মুখে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করেন চা শ্রমিকরা। আম্বরখানা- বিমানবন্দর রোড অবরোধ করা হয়। অবরোধের এক পর্যায়ে সিলেটের জেলা প্রশাসক মোঃ জয়নুল আবেদিন এসে ৩ দিনের মধ্যে দাবি পূরণের আশ্বাস দেন, আসেন স্থানীয় চেয়ারম্যানও। এ সময় অবরোধ থেকে স্লোগন উঠে 'মুখের কথায় মানি না, লিখিত ছাড়া বুঝি না' 'টাকা যার শিক্ষা তার, এই নীতি মানি না'' গ্যাস দিয়েছি, মাঠ দিয়েছি, স্কুল আমরা দিবো না'। অবরোধ থেকে বাগানে কর্মবিরতীসহ বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়, এবং প্রস্তুতি চলতে থাকে। ২৫ ডিসেম্বর শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এবং সর্বশেষ ১ জানুয়ারি'১৭ জেলা প্রশাসক ১০ ভাগ কোটা প্রদানের কথা নিশ্চিত করেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ একে আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয় উল্লেখ করে আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানান। নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে উক্ত বিদ্যালয়ে ৪০ ভাগ কোটা ও প্রতি চা বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ এবং শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে চা বাগানের শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোটাসহ ৫ দফা দাবিতে সংগঠনের ধারাবাহিক আন্দেলনকে বেগবান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি কেন বাড়বে না?

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ১৫১-১৬৩ ডলার। এর মধ্যে কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের সরকার মজুরি বাড়িয়ে ২০১৬ সাল থেকে নির্ধারণ করেছে যথাক্রমে ১৪০ ডলার ও ১০৭-১৫৬ ডলার। পাকিস্তান জুন, ২০১৫ থেকে মজুরি বাড়িয়ে সর্বনিম্ন প্রায় ১২০ ডলার নির্ধারণ করেছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিয়েতনামের সরকার শ্রমিকের জন্য খুবই সস্তায় আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য সুবিধাও দিয়ে থাকে। এই দেশটি এখন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগী দেশ।

মজুরি বৃদ্ধি কত হওয়া দরকার

১২০০ টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে কোন শিল্প অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। বাড়ি ভাড়া যেমন বাস্তবের এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তেমনি চিকিৎসা ভাতা, টিফিন ভাতা এবং মূল বেসিক বেতন সবই অপ্রতুল।

গার্মেন্টস সেক্টরে চিকিৎসা ভাতা ২৫০ টাকা মাত্র। ডায়াগনস্টিক টেস্ট-ওষুধের মূল্য বাদ, শুধু একবার মাত্র একজন এমবিবিএস ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেই কমপক্ষে ৫০০ টাকা লাগে। তাই আমাদের দাবী মাসে ৭০ টাকার ঔষধ ধরে ন্যূনতম চিকিৎসা ভাতা ২৫০ টাকার স্থলে ৫৭০ টাকা করা হোক।

যাতায়াত ভাতা অবশ্যই দৈনিক ১৫ টাকার কমে কোনভাবেই হবে না। এই জন্য দৈনিক ৩০ টাকা হলেও ২৬ দিনে ৩০x২৬ = ৭৮০ টাকা দাঁড়ায়। তাই আমরা দাবী করছি মাসে ২০০ টাকার স্থলে ৭৮০ টাকা মাত্র যাতায়াত ভাতা করা হোক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটহিসাব করে দেখিয়েছেন দৈনিক ১০ ঘন্টা কাজ করলে (যদিও বাস্তবে ১৪/১৬ ঘন্টা হামেশাই শ্রমিকরা কাজ করে থাকে) একজন পুরুষ শ্রমিকের ৩৩৬৪ কিলোক্যালরি এবং নারী শ্রমিকের ২৪০৬ কিলোক্যালরি তাপ দেহে (যদিও নারীদের মাতৃত্বকালীন সময়ে অনেক বেশী দরকার হয়) প্রয়োজন হয়। সুতরাং নর-নারী নির্বিশেষে গড়ে (৩৩৬৪+২৪০৬/২) ২৮৮৫ কিলোক্যালরি তাপ উৎপাদন সম্বলিত খাদ্য প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আরও ৮৫ কিলোক্যালরি বাদ দিয়ে ন্যূনতম ২৮০০ কিলোক্যালরি তাপ উৎপাদন করতে পারে শরীরে এমন খাদ্য গ্রহণ করার জন্য খাদ্য খরচ পড়বে ১০৯ টাকা প্রতিদিন। সব কিছু মিলে অবশ্যই একজন শ্রমিকের মূল বেতন ১০হাজার ও মোট বেতন ১৬ হাজার টাকা হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকরা এই ন্যায্য দাবিতেই লড়ছে। কিন্তু সরকার এই দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে হামলা হুমকি ভয় গ্রেফতার করে মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করছে।

এল.পি.জি ব্যবসায়ীদের একতরফা মুনাফার স্বার্থে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারা করছে সরকার

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারার প্রতিবাদে ১২ ডিসেম্বর সোমবার বিকাল ৪টায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক বামমোর্চার সমন্বয়ক গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুজ্জামান সাকন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আব্দুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু প্রমুখ।

আলুর ন্যায্য মূল্যের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)'র বিক্ষোভ

রংপুর

আলুসহ সকল সবজী চাষীদের রক্ষা ও সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা শাখার আয়োজনে গত ১৫ জানুয়ারি রোববার একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে সংগঠন কার্যালয় চত্বরে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ (মার্কসবাদী)'র আহবায়ক কমরেড আহসানুল হাবিব সাঈদ, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, আলু চাষিরা প্রতি বছর ন্যায্য মূল্য না পেয়ে দিন দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত হিমাগার না থাকার ফলে চাষিদের উৎপাদিত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। যত সামান্য কোল্ড ষ্টোরেজ রয়েছে তা নিয়েও চলে নানা দুর্নীতি ও লুটপাট। তাই বক্তারা অবিলম্বে আলুসহ সকল সবজী চাষিদের রক্ষা করতে ফসলের মূল্য নিশ্চিত এবং পর্যাপ্ত কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণের দাবি জানান। সেইসাথে কৃষি কৃষক রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

একই দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৫ জানুয়ারি প্রেসক্লাব চত্বরে মানবন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে মানববন্ধন চলাকালে সমাবেশে বক্তৃতা করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সদস্য আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক, ছাত্রনেতা রোকনুজ্জামান রোকন প্রমুখ।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার প্রতিক্রিয়া

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ৫ জানুয়ারির যে প্রহসনের নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তা এই সরকারের বৈধতাকে জনগণের সামনে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এই গ্রহণযোগ্যতার অভাবের কারণেই তারা বাংলাদেশকে একদিকে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে; অন্যদিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ-মত প্রকাশ সহ সকল ধরনের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বাধানিষেধ নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একটি অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সকলের দাবি হিসেবে আছে। কিন্তু নবগঠিত নির্বাচন কমিশন সেই দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি।

সংবিধান প্রণয়নের ৪৬ বছর হলেও নির্বাচন কমিশন যে 'আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে' নিয়োগ পাবার কথা, সেই আইনটি কোন সরকার, কোন সংসদ প্রণয়ন করেনি। ফলে পুরো বিষয়টিই সরকার প্রধানের খেয়াল খুশি মত হওয়াটা এই দেশে আইনী বাস্তবতা। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা মনে করে, বর্তমান আওয়ামী লীগসহ বিগত সরকারগুলো নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্যই এই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ থেকে বিরত থেকেছে।

নীতিনিষ্ঠ লড়াইয়ের মধ্যেই আশার আলো খুঁজতে হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) কর্মী ও বহু দল নিরপেক্ষ মানুষ। পুলিশী অবস্থান উপেক্ষা করে ভোর থেকে টানা মিছিলে মানুষের কাছে এ বার্তাই পৌঁছে দেয় –'ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে কেবল দূরে দাঁড়িয়ে সমর্থনই নয়, নামতে হবে রাস্তায়। শক্তিকে কেবল যুক্তিতে নয়, শক্তি দিয়েও মোকাবেলা করতে হবে। সেজন্য বিবেকবান মানুষের সক্রিয়তা চাই। টানা মিছিল-সমাবেশে পা দু'টি ভারী হয়েছিল কি'না , ভাববার অবকাশও কেউ খোঁজেনি। কেননা এ দু'টি পা নিয়ে আরো বহুদূর যেতে হবে। সামনে বহু চড়াই উৎরাই। যুক্তিবুদ্ধি হারিয়ে ক্ষমতামত্ত শাসকদের স্বৈরাচারের আরো বহু কিছু দেখার বাকী যে এখনো! তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে– হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে এ প্রত্যয়ই যেন ঘোষিত হল।

সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করে দৃষ্টি ফেরাতে চাইছে সরকার

যুক্তি-তর্ক, বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দাঁড়াতে না পেরে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকেই সম্বল করছে সরকার। আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের পর এবার ২য় দফায় চট্টগ্রামের একটি সভায় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কমিটির নেতা-কর্মীদের সুন্দরবনের বাঘের কাছে গিয়ে কুশল জানতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর খেদ হল, আন্দোলনকারীরা বাঘ নিয়ে যত চিন্তিত, মানুষ নিয়ে তত নয়। অথচ বিশ্ব বাঘ সম্মেলনের বক্তব্যে বাঘ নিয়ে উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রীও প্রকাশ করেছিলেন, –'বাঘ বাঁচলে সুন্দরবন বাঁচবে, সুন্দরবন বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে।' সংবেদনশীল মানুষমাত্রই জানেন, প্রকৃতি-পরিবেশের বাইরে মানুষের আলাদা অস্তিত্ব নেই। বন-প্রকৃতি পরিবেশ মানুষ ছাড়াও বাঁচতে পারে, কিন্তু এগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচবে না। গোটা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঋতু পরিবর্তন, উপকূলে ভাঙন ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে। কার্বন নিঃসরণ কমানোর দাবি মানতে বাধ্য হচ্ছে উন্নত ধনীদেশগুলো। একসময়ের কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি থেকে ব্যাপকভাবে সরে আসছে তারা; তীব্র পরিবেশ দূষণের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি এড়াতে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর দিকে ঝুঁকছে। প্রকৃতি-বন-নদী রক্ষার আকুলতা-উদ্বেগ আমরা কতটুকু অনুভব করছি? জলবায়ু তহবিলের ভাগ পেতে যত মরিয়া, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভূমিকা পালনে কতটা তৎপর? – এসব প্রশ্নে সরকার নিরুত্তর। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গত ২৫ বছরে ১লক্ষ ২৫হাজার হেক্টর শালবনের ৮৫ভাগ উজাড় হয়ে ১৭হাজার ৫শ হেক্টর টিকে আছে। ৭লাখ হেক্টর পার্বত্য বনাঞ্চলের মধ্যে অবশিষ্ট আছে ১ লক্ষ হেক্টর। আর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেখানে ২৫ভাগ বনভূমি প্রয়োজন, সেখানে আমাদের আছে মাত্র ১১ভাগ! ফলে একটা সুন্দরবনের গুরুত্ব কেবল ৩৫-৪০লক্ষ মানুষের জীবিকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় কোটি মানুষের প্রতিরক্ষাব্যুহ হিসেবেই নয়; আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রায় একমাত্র সম্বল হিসেবেও। ফলে প্রধানমন্ত্রী যখন নিরাপদ দূরত্বে বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থান ব্যাখা করে, আন্দোলনকারীদের দূরত্ব মেপে আসার পরামর্শ দেন, তখন উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে বারবারই বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী যে দূরত্বের কথা বলছেন তা মোটেই নিরাপদ নয়। সরকারি আতিথ্যে ও তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন পরিদর্শন করে ইউনেস্কোও একই কথা বলেছে। আর বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষতার যুগে গজ-ফিতা দিয়ে দূরত্ব মাপার প্রয়োজন হয় না, গাণিতিক সূত্র দিয়ে মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রসহ যে কোনো কিছুর দূরত্ব মাপতে পারে। হয়তো বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী প্রধানমন্ত্রীকে উপদেষ্টারা তা জানানোর সময় পাননি! সম্প্রতি ১০০টনের কয়লা বোঝাই জাহাজ ডুবে যাওয়ার কি ক্ষতি হয়েছে – এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন উত্থাপন নিয়ে কাণ্ডজ্ঞানের প্রসঙ্গে না তুলেও বলা যায়, বিগত সময়ে তেলবাহী জাহাজডুবির ক্ষতির কথা বিশেজ্ঞরা যুক্তি-প্রমাণ সহকারেই তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এ সব ক্ষতি তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হয় না, ধূমপানের ক্ষতির মতই দীর্ঘমেয়াদে তার প্রকাশ ঘটে। বড় পুকুরিয়া প্রকল্পে ক্ষতির কথাও তো সরকারি রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে।

গায়ের জোরে সব কিছু করার মনোভাবের বিরুদ্ধে এখনি প্রতিবাদ না হলে কোনো গণতান্ত্রিক অধিকারই রক্ষা পাবে না

সরকারের ক্ষমতার দাপট সুন্দরবন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট। কেবল সুন্দরবন প্রশ্নে নয়, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, গণঅধিকার সংকোচনের লক্ষে নানা আইন প্রণয়ন, দলীয়করণ, সরকারি বাহিনীর বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন ও হত্যাসহ সবক্ষেত্রেই বিচারহীনতা – এসব কিছুর মধ্য দিয়ে এমন এক যুক্তি বুদ্ধিহীন, প্রশ্নহীন পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে মানুষের প্রতিবাদের মনই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সরকারও এ পরিবেশ চায়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কাছে কোনো প্রশ্নই তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি উচ্চকিত করেছে জাতীয় কমিটি। মানুষ চায় কার্যকর একটা লড়াই গড়ে ওঠুক। জাতীয় কমিটি এ আকুতিকে ভাষা দিয়েছে।

নীতিনিষ্ঠ লড়াইয়ের মধ্যেই আশার আলো খুঁজতে হবে

যখন সরকারি দলের লোকেরা দখলবাজি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে খুনোখুনিতে ব্যস্ত; যুব সমাজের পতনোন্মুখ চেহারা দেখে মানুষ রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে; তখন টিম টিম প্রদীপের মত স্বার্থকেন্দ্রিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে একদল যুবক-তরুণ-প্রবীণ সমষ্টিচেতনায় লড়াই করছে। হ্যাঁ সমর্থন থাকলেও যে নৈতিক আবেদন মানুষ অন্তরে ধারণ করে কষ্ট স্বীকার করে, কোনো ১ দিন চাকুরী থেকে বিরত থাকে, হুকুম তামিলে বিরত হয়ে জীবিকার উপায় বন্ধ রাখে, অন্যদের চোখে চিহ্নিত হবার ভয় অতিক্রম করে সামাজিক দাবির প্রতি একাত্ম হয় – তা হয়তো বেশিমাত্রায় ঘটেনি। কিন্তু মানুষের সমর্থন ছিলই। হরতাল পূর্ব প্রচারণা-মিছিল-চলাকালে হাততালি দিয়ে স্বাগততত জানাতে অনেককেই দেখা গেছে। কেউ বাসের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে নিজের অব্যক্ত ভাষাকে ব্যক্ত করছে –'আন্দোলন জোরদার করুন।' মানুষের এ উৎসাহ-প্রেরণা-সমর্থন-সমালোচনা শাসকদের গুলি-ভয়কে উপেক্ষার শক্তি। আন্দোলনের চড়াই উৎরাই পার হবার পাথেয়।

উন্নয়নের শোরগোলে চাপা পড়ছে মানুষের আর্তনাদ

(২য় পৃষ্ঠার পর) আলাদা আলাদাভাবে বিরাট জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে। এসব অবকাঠামো তৈরির জন্য আবার এসব জায়গার সাথে মূল সড়ক-রেল-নৌপথের যোগাযোগের জন্য রাস্তা-ব্রিজ ইত্যাদি তৈরি করা দরকার। এসকল কাজে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। আর কিছু শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে কর্পোরেটদের টেকনিক্যাল অফিসে দক্ষতা বিক্রি করার জন্য। একটা দেশের সামগ্রিক পরিকল্পনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিল্পায়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটা জনগোষ্ঠীকে উন্নত থেকে উন্নততর করার অংশ হিসেবে এই উন্নয়ন নয়, কর্পোরেটদের একটা ক্রাইসিসকে ট্যাকল করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সবচেয়ে সস্তা দামে দিতে পারার কারণেই কিছু মানুষের গতি হচ্ছে। কর্পোরেটেরা আর কোথাও আরও সস্তায় এই দক্ষতা পেলে এই বাজারের দিকে তাকাবেও না। তখন সংকট আরও ঘনীভূত হবে।

এই দক্ষতা তৈরির জন্য 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর শ্লোগান তোলা হলো। পাঠ্যক্রমে আই.সি.টি (ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি) যুক্ত করা হলো। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত নিয়ে এই আই.সি.টি শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রচার শুরু করলেন। মানুষের মধ্যে ধারণা এলো প্রযুক্তিতে এগিয়ে না গেলে আমাদের দেশের উন্নতি কিছুতেই হতে পারে না। এই প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়া মানে উচ্চশিক্ষিত দক্ষ প্রযুক্তিবিদ তৈরি নয়, যে বাজারটা বাংলাদেশে এই সময়ে এসেছে, তার প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু টেকনোলজিস্ট তৈরি করা।

ফলে এই সব উন্নয়ন এবং ডিজিটালাইজেশন আসলে কিছু শ্লোগান এবং সকল দেশের সকল ফ্যাসিবাদী সরকারকেই এই সকল চমক লাগানো কথাবার্তা বলতে হয় জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য।

কর্মসংস্থানের আরেকটা ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে দেশে। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সংখ্যা যখন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, তখন পয়সা দিয়ে যুবকদের পার্টির স্বেচ্ছাসেবক বানানো শুরু হলো। তারা দরকার হলে পার্টির হয়ে লাঠালাঠি করবে। রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের সাথে একটা প্যারালাল প্রশাসন ব্যবস্থা পার্টি নিজে চালু করলো। সকল সরকারি অফিসে, স্কুলে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তারা একাধারে নিয়ন্ত্রক ও মিডলম্যান। তাদেরকে না ধরলে কোন কাজ হয় না। এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ সংকটগ্রস্থ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যকে ঠিক ঠিকভাবে ধরে বলেছিলেন, " . . . তারা (পুঁজিপতিরা) দেখলো বেকারদের মধ্যে শিক্ষাসংস্কৃতি থাকলে তার থেকেই বিক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লবের চিন্তা জন্ম নিতে পারে। তাই শিক্ষা-সংস্কৃতির যেটা নীতি-নৈতিকতার বুনিয়াদ, সেটাকে তারা মেরে দিতে চাইলো, অপরদিকে বেকারদের একটা অংশকে পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে অসৎ পথে পরিচালিত করলো। . . . অর্থাৎ পার্টিগুলো এখন হয়েছে এক ধরনের এম্প্লয়মেন্ট এজেন্সি।"

সকল রকম মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ চলছে

দেশে প্রতিদিন গড়ে ৯টি খুনের ঘটনা ঘটছে। প্রতিমাসে ধর্ষিত হচ্ছেন ৪০ জন নারী। গত তিন বছরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ৩১২ জন গুম হয়েছেন। শুধু ২০১৫ সালেই বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ৯৮টি। এর মধ্যে ক্রসফায়ার করে মারা হয়েছে ৭০ জনকে। পুলিশ প্রশাসন নিজেই বড় বড় খুনের সাথে জড়িত। নারায়ণগঞ্জের ৭ খুনের মামলায় সরকারের এলিট ফোর্স র‍্যাব জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রতিদিন পুলিশের বিরুদ্ধে গড়ে ৩৮টি অভিযোগ পুলিশ সদর দপ্তরের সিকি-উরিটি সেলে এসে জমা হচ্ছে।

সংবাদপত্রের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। যে খসড়া সম্প্রচার নীতিমালা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে তা চূড়ান্তভাবে অগণতান্ত্রিক। আইসিটি এ্যাক্টের ৫৭ ধারায় একের পর এক গ্রেফতার চলছে। এই ধারাটিই ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। উপরন্তু এই ধারার অধীনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কেউ মন্তব্য করলে তাকে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমের কাজই হচ্ছে সরকারের সমালোচনা করা।

একই সাথে আরেকটি আইনের খসড়া চলছে- 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকরণ আইন'। এও চূড়ান্তরূপে গণবিরোধী। দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার ওপরে এরকম একটি আইন করা বাস্তবে শাসক দল কর্তৃক লিখিত ইতিহাসকেই একতরফা সুরক্ষা দেয়ার জন্য।

একটা ফ্যাসিবাদী সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে সব জায়গায়

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়, দেয়ালে লিখনে, বিলবোর্ডে এখন এমনকি প্রাথমিক ক্লাসের পাঠ্যবইয়ের পেছনেও প্রধানমন্ত্রীর প্রচারণা, প্রশস্তি তুলে ধরা হচ্ছে। একটা উগ্র সাংস্কৃতিক মনন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে গোটা জাতির মধ্যে। রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হলেন জাতির নেতা। স্বাভাবিকভাবেই তিনি রাষ্ট্রের সেই একমাত্র দলেরও নেতা। তিনি সমস্ত নিয়ম-কানুন-নীতি-পদ্ধতি ঠিক করেন। তার ইচ্ছাতেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। তার মানে এই নয় যে, জনগণের ইচ্ছার উর্ধ্বে তার ইচ্ছা। তিনি হলেন জনগণের ইচ্ছার রূপকার। তিনি জানেন, সবচেয়ে ভাল জানেন এবং সবার চেয়ে বেশি জানেন কি করতে হবে, কোন লক্ষ্যে জাতিকে নিয়ে যেতে হবে। তাই তার স্তুতি, প্রশস্তি, তার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দল-মিডিয়া-বিচার-আদালত-প্রশাসন যা কিছুই হোক, থাকবে। এর বিপরীত কোন চিন্তা, যুক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন যে কোন কিছুকেই প্রশাসনের নির্মম আঘাতের মুখে পড়তে হবে।

এরকম অবস্থায় দেশের মধ্যে একধরনের যুক্তিহীন, তর্কহীন, জবাবদিহিতাহীন পরিবেশ তৈরি হয় যা সকল রকমের গোড়ামি ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে উস্কে দেয়। দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সকল রকমভাবেই মার খায়। এই অবস্থা একটা দেশ ও জাতির জন্য খুবই দুর্যোগের।এ অবস্থা দেশের বামপন্থী দলসমূহ তথা সকল স্তরের গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ধারণকারী লোকেদের এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা দরকার।

যে দেশে মানুষ বড়

(৩য় পৃষ্ঠার পর) কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল এই বর্ষায় আমাদের পুরাতন প্রজা মনু শেখের পুত্র, ছেলে-মেয়ে বউকে খাইতে দিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। ভাসান চরে বন্যা আসিয়া প্রতি বৎসর ফসল ডুবাইয়া দিয়া যায়। অসহায় কৃষকেরা ভিখারীর বেশে শহরে, বাজারে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। যে বছর বৃষ্টি হয় না, প্রখর গ্রীষ্মের খর-দাহনে ধানের অঙ্কুর পুড়িয়া যায়। অসহায় কৃষক আকাশের পানে চাহিয়া প্রার্থনা করে 'আল্লা মেঘ দাও, পানি দাও।' যে বৎসর সময়কালে আল্লার মেঘ নামে না সে বৎসর ইহাকে বিধিলিপি মনে করিয়া আপন কপালে শুধু করাঘাত করে। তারপর দুর্ভিক্ষ আসিয়া তার আদরের সন্তান-সন্ততিগুলিকে চিরকালের ঘুম পাড়াইয়া দিয়া যায়। আজ আমাদের দেশে লেনিনের মতো এমন নেতার জন্ম হইতে পারে না, যার আগমনে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশ এমনই ধনধান্যে সাজিয়া ওঠে!...

দুপুরে চলিলাম তাসখন্দের মসজিদ দেখিতে। সকাল বেলা নানা স্থানে ঘুরিয়া বড়ই ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম। আমার অজানিতেই বারানভ সাহেব সেখানে আমার ভ্রমণ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এজন্য তাঁর সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হইল। আমাদের দেশে কত শত শত মসজিদ। সমাজতান্ত্রিক দেশে আসিয়া মসজিদ দেখিয়া আমার কি লাভ হইবে? বারানভ সাহেব বলিলেন, 'সেখানকার কর্তৃপক্ষেরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া চলুন।' সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়িতে যাইয়া বসিলাম। সত্য সত্যই সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা সহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনেকক্ষণ নামাজ আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন ছিল জুম্মাবার। প্রায় আড়াই হাজারের মতো লোক জমায়েত হইয়া নামাজ পড়িতেছেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বৃদ্ধ বা পৌঢ়। অল্প বয়স্ক দু'একজন মাত্র যুবককে নামাজ পড়িতে দেখিলাম। এই প্রসঙ্গে আমাদের ঢাকার চকবাজারের মসজিদের নামাজ জমায়েত মুসল্লিদের কথা মনে পড়িল। এখানেও নামাজরত মুসল্লিদের মধ্যে বৃদ্ধদের সংখ্যাই অধিক। যুবকদের সংখ্যা নখে গোনা যায়। সমাজতন্ত্রবিরোধী কোন কোন লোক আমাদের দেশে ঘটা করিয়া প্রচার করেন সোভিয়েত দেশে মুসল্লিদিগকে নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না। মসজিদগুলি হয় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা সেখানে গভর্নমেন্টের অন্যান্য অফিস বসিয়াছে। আমাদের অসাম্য-ভরা দেশে যদি কেহ জনগণের সুযোগ সুবিধার জন্য কোন প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন তাহাদিগকে থামাইয়া দেওয়ার জন্য উপরোক্ত মিথ্যা প্রচারকার্য এক অভিনব কৌশল। সোভিয়েত দেশের অতিথি হইয়া ইহাদের অতিথিপরায়ণতায় বহুবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী খাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন এদেশে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নাই। চক্ষু মেলিয়া যাহারা সত্যকে অস্বীকার করেন আল্লাহ যেন তাহাদের ক্ষমা করেন।

এখানে আসিয়া মনে হইল রুশ সভ্যতা এদেশবাসীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। বহুলোক এখনো এদেশের জাতীয় পোশাক পরে। মেয়েদের পোশাকেও ইউরোপীয় অনুকরণ নাই। অতীতে তাসখন্দের মেয়েরা যে পোশাক পরিয়া থাকিত এখনকার মেয়েরাও সেই পোশাক পরে। একমাত্র পার্থক্য বোরখার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এখনকার মেয়েরা বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে। তার ফলে শিক্ষায়-দীক্ষায় ইহারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া চলে। এদেশেও ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন মেয়ে। শিক্ষয়িত্রীদের অনুপাতও অনেকটা তেমনি। অল্পক্ষণেই নামাজ শেষ হইল। আমাদের দেশের মতো ভিখারী আসিয়া নামাজীদের ঘিরিয়া ধরিল না। সোভিয়েত দেশে ভিখারী নাই। কোন রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কেহ পানির গ্লাস লইয়া মুসল্লিদের দিয়া তাহার উপরে ফুক পড়াইয়া কুসংস্কার ঘরে লইয়া গেল না। এদেশে কাহারো অসুখ হইলে বিনা ভিজিটে ডাক্তার ডাকিয়া তাহার চিকিৎসা করায়।... আমাদের দেশে চার মাইল বা পাঁচ মাইলের মধ্যে একজনও ডাক্তার নাই। এদেশে ডাক্তারের ছড়াছড়ি; যেখানে সেখানে হাটে-মাঠে-বাটে সর্বত্র ডাক্তার। রেলস্টেশনে ডাক্তার, উড়োজাহাজের স্টেশনে ডাক্তার, হোটেলে ডাক্তার, তারপর পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তার। যাকে যখন খুশি ডাক দিলেই হইল। তিনি তার কমপাউন্ডার সঙ্গে লইয়া তখনই আসিয়া হাজির হইবেন। টাকা-পয়সা ভিজিটপত্র দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।... ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ মায় বইপুস্তক সবই রাষ্ট্র বহন করে।...ব্যবসা-বাণিজ্য দোকানপাট সবই রাষ্ট্রের হাতে। সব জায়গায় জিনিসপত্রের এক দাম। যেখানে যতগুলি দোকানের প্রয়োজন সেখানে ততগুলিই দোকান আছে। আমাদের দেশের মতো অনেক দোকান খুলিয়া জাতির জনশক্তির অপব্যয় এরা করে না।...

সাতলানা জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা বলুন তো আপনার পূর্ববাংলা কেমন দেশ? আমি বলিলাম,' পৃথিবীতে কত দেশই তো দেখিলাম, তোমাদের দেশও দেখিলাম। ভারি সুন্দর। কিন্তু আমার পূর্ববাংলাকে আমার আরও ভাল লাগে। পূর্ববাংলার সারা দেশ ভরিয়া শ্যামল-শস্যের আলপনা আঁকা। সেই শ্যামল শস্য ভরা মাঠেরও কত রঙ! ফিকে সবুজ,ঘন সবুজ, হলুদে কালোতে মেশা সবুজ। পাটের ক্ষেত, ধানের ক্ষেত, মটর মসুরির ক্ষেতে কত রঙেরই সবুজ। এর রূপ দেখিয়া চোখের তৃষ্ণা বুঝি মেটে না। এর হাটে গান, মাঠে গান, ঘাটে গান। সমস্ত দেশে যেন অপূর্ব গেঁয়ো গানের ছড়াছড়ি। আর তারই ভিতরে দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে কত সুন্দর সুন্দর নদী। একবার আমি আমেরিকা গিয়াছিলাম আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সভায় বক্তৃতা করিতে। সেই সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম, 'আমাদের শ্যামল দেশটি যেন এক অপূর্ব বীণাযন্ত্র। কে এক অদৃশ্য সুরকার এই নদীগুলির রূপালী তারে তার কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া এই দেশের অপূর্ব ভাটিয়ালী সুর রচনা করিয়া যাইতেছে।'

সাতলানা মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,' আপনার দেশের এই অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই যাইয়া আপনার দেশে বেড়াইয়া আসি। আপনার দেশের লোকগুলির কথা বলিলেন না? তাহাদের কথাও বলুন।' আমি উত্তর করিলাম,'এমন সুন্দর দেশে আমাদের সকল থাকিয়াও যেন কিছুই নাই। তোমাদের দেশে যেমন সব লোক সমান, আমাদের দেশে তেমন নয়। বিশ বছর হইল আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আমার দেশের জনগণ দু'মুঠো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তুমি যদি আমাদের দেশে যাও দেখিবে, মুষ্টিমেয় লোক কেহ কেহ বড় বড় শিল্প কারখানা গড়িয়া, কেহ কেহ দেশ-বিদেশে বাণিজ্য প্রসারিত করিয়া, কেহ কেহ বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদে আসীন হইয়া ধনসম্পদে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। আর অগণিত জনগণ রোগে-ব্যাধিতে অনাহারে ধাপে ধাপে নিচে নামিয়া যাইতেছে। দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের করতলগত হইয়াছে। সেই করতল দিনে দিনে আরও প্রসারিত হইতেছে।...আমার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের কাহিনী শেষ হইতে চলিল।...সন্ধ্যা হইলে মিঃ সিডারফের বাসায় মিঃ গঙ্কোওস্কির সঙ্গে দেখা করিলাম। এমনি হাসিখুশি মানুষটি। আমার জন্য কয়েকটি উপহার লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিলাম। এদেশে আসিয়া আমি কোথায় কোথায় গিয়াছি, কোন জায়গা আমার কেমন মনে হইয়াছে তন্ন তন্ন করিয়া তিনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই আলোচনার সময় একটি কথা আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম,'এশিয়ার সর্বহারাদের দুইটি মাত্র চক্ষু। একটি সোভিয়েত দেশ; আর একটি মহাচীন। এই দুই দেশের দিকে সকল দেশের সর্বহারারা বড় আশায় চাহিয়া আছে। আপনাদের আদর্শের কতক লইয়া তাহারা একদিন আপনাপন রাষ্ট্রকে আরও উন্নত করিয়া গড়িবে।...

একজন রুশ ভদ্রলোক আমাকে একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ' সোভিয়েত দেশে আসিয়া কোন্ জিনিসটি আপনার খুব ভাল লাগিল?'

আমি বলিলাম,'এদেশে আসিয়া আমার সবচাইতে ভাল লাগিল, আপনারা আপনাদের জনগণকে সব চাইতে উচ্চ আসন দিয়াছেন। আর আপনাদের গভর্নমেন্টের সহিত জনগণ একাত্ম। সেই জন্য আপনাদের দেশ যেন কোন যাদুকরের যাদু-স্পর্শে উন্নতির শিখর হইতে শিখরে আরোহণ করিতেছে। মস্কো, লেনিনগ্রাড যেখানেই গিয়াছি সেখানেই আমি আপনাদের এই অগ্রগতির কাহিনী রূপায়িত হইতে দেখিয়াছি। '...বিদায় সোভিয়েতভূমি, বিদায়! রূপে ঐশ্বর্যে আদর্শবাদে তুমি সকল দেশের অনুকরণযোগ্য।

বাল্যবিবাহকে বৈধ করার আয়োজন করছে সরকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিবাহ হয়। সরকার ২০২১ সালে বাল্যবিবাহ ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে যে ঘোষণা দিয়েছে তার সঙ্গেও এই আইন সাংঘর্ষিক। ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বাল্যবিবাহ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এই খসড়া আইন বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। শিশু অধিকার সনদ ও সিডও সনদকেও তা লংঘন করেছে। একই সাথে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ও শিশু আইন ২০১৩ কে লংঘন করেছে। শুধু তাই নয় পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) সহ অন্যান্য বিধি-বিধানের বিপরীতে সরকার এই আইন পাশ করতে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার বাড়বে

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সমান। মাধ্যমিক স্তরে ৫৩ শতাংশ, কলেজ পর্যায়ে ৪৭ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষায় ৩৩ শতাংশ মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ করছে। ইউনিসেফের 'উইমেন্স লাইফ চয়েস এন্ড এটিচুডস ২০১৪' এর গবেষণায় দেখা গেছে, বিবাহ সংক্রান্ত কারণে ২৪ শতাংশ মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর সরকারের অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের সংখ্যা ৩০ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ৭০ শতাংশ কিশোরী লেখাপড়া থেকে বাদ পড়ে যায় (২২ নভেম্বর ২০১৬ প্রথম আলো)। আমাদের দেশের মেয়েদের পশ্চাৎপদ অবস্থানের চিত্র বুঝতে এই তথ্যই যথেষ্ট। ফলে এই আইন ঐ কিশোরীদের জীবনে আরো ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে, ঝড়ে পড়ার হারও বাড়বে।

মাতৃমৃত্যুর হার ও মাতৃস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়বে

১৮ বছরের পূর্বে নারীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হয় না। ভগ্ন স্বাস্থ্যের মা ভগ্ন স্বাস্থ্যের শিশুই জন্ম দিবে এটাই স্বাভাবিক। সন্তান যখন গর্ভে থাকে তখন মাকে পুষ্টিকর খাবার দেয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের দেশের কয়জন মানুষের আছে? দি ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সী ইনিশিয়েটিভ এর তথ্যমতে, 'বাংলাদেশে সন্তান প্রসবের সময় প্রতি লাখে ১৭০ জন নারী মৃত্যুবরণ করে। ৭১ শতাংশ নারীর পারিবারিক আয়োজনে প্রসবকালীন সেবা দেয়া হয় এবং মাত্র ৩৬ শতাংশ নারী দক্ষ ধাত্রীর সহযোগিতা পায়।' বাল্যবিবাহের কারণে নারীরা যৌনরোগ, গর্ভকালীন জটিলতা, প্রসবকালীন স্বাস্থ্যঝুঁকি, জরায়ূ মুখে ক্যান্সার ও ফিস্টুলা সহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হবে। বহু বছর আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বলেছিলেন, "...সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য তাহাও বাল্য পরিণয়যুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মূখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।" আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ সম্পর্কে এই বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। অথচ তথাকথিত ডিজিটাল বাংলাদেশে "অপ্রাপ্তবয়স্ক" মেয়েদের বিয়ের জন্য সরকার আইনে বিশেষ বিধান রেখেছে।

বিশেষ বিধান কি নারীর নিরাপত্তাহীনতা কমাবে?

দেশে প্রতিদিন ৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয় (ঢাকা ট্রিবিউন, জুলাই ০১, ২০১৬)। সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ সালের তথ্যানুযায়ী, দেশে বর্তমানে বিবাহিত নারীদের শতকরা ৮০ জনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন। সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয় স্বামীর হাতে। ফলে বিবাহ নারীর জন্য নিরাপদ থাকার একমাত্র পথ নয়, পথ হলো মনুষ্যত্ব-বিবেক-সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে বাঁচার লড়াই। যে মা-বাবা মেয়ের নিরাত্তাহীনতার কথা ভাবছেন আপনারা কি এই সমাজে নিরাপদ? সকালে বাড়ি বা বাসা থেকে বের হলে নিরাপদে ঘরে ফিরবেন, তার নিশ্চয়তা কি সমাজে বা রাষ্ট্রে আছে? উত্তর, নেই। আপনার নিরাপত্তা নেই, আর এক্ষেত্রে মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা আরো বেশি। ফলে সরকার মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে ভাবছেন না, ভাবছেন ক্ষমতার নিরাপত্তা নিয়ে।

এবার কি বলবেন আওয়ামী লীগের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা?

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মৌলবাদের আদর্শিক জমিন তৈরি করে দিচ্ছে। সে কারণেই প্রগতিশীল লেখকদের লেখা বাদ দিয়ে ধর্মীয় ভাবধারার লেখা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করছে। যে সমস্ত মহান সাহিত্যিকরা একসময় সামন্তীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মশাল জ্বেলেছেন তাদের লেখা বাদ দিয়েছে। এতে আওয়ামী লীগের সাম্প্রদায়িক চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ৩৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় ছাত্র সমাবেশ করেছে। ছাত্র সমাবেশ শেষে পাঠ্যপুস্তকের লেখা বিকৃতি, লৈঙ্গিকবৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তু অর্ন্তভুক্তির প্রতিবাদে মিছিল সহকারে স্মারকলিপি শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, দপ্তর সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার, অর্থ সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী।

সাম্প্রদায়িক মোড়কে পাঠ্যপুস্তক, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের লেখা বাদ,
এবার কি বলবেন আওয়ামী লীগের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরা?

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তকে এবছর যে নজিরবিহীন ভুল হয়েছে তা শুধু সরকারের কর্মকর্তাদের বা এনসিটিবির প্রকাশই নয়, এই দায়িত্বহীনতার মদদপুষ্ট। ঘটনা সরকারের দাবি অনুসারে হেফাজতের লেখা বাতিল এবং সংযোজনই প্রমাণ করে এতে সরকারও জড়িত। এভাবে হেফাজতের সাথে আপোষ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে চায়। মুখে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বললেও বাস্তবে জঙ্গিবাদ-*(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নবগঠিত নির্বাচন কমিশন
গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার প্রতিক্রিয়া

অবশেষে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নতুন নির্বাচন কমিশনের নাম ঘোষণা করেছেন। জনগণ আশা করেছিলেন, প্রস্তাবিত নামগুলোর মাঝ থেকে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের বাছাই করা হবে। তা কতখানি ঘটেছে, সে নিয়ে আর সকলের মতই আমরাও সংশয়ী। নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কমিশনারই আমলা এবং তুলনামূলকভাবে অপরিচিত। সাধারণ নাগরিকরা তো বটেই, রাজনৈতিক মহলও তাদের বিষয়ে খুব বেশি কিছু জানেন না। রাজনৈতিক দলসহ বিশিষ্ট নাগরিকরা প্রস্তাব করেছিলেন, সাহসী দৃঢ় এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিয়েই নির্বাচন কমিশন গঠন করার। নাম চূড়ান্ত করার পর তাদের কোন্ কোন্ যোগ্যতায় বাছাই করা হয়েছে, তা আলোচনা করা হয়নি। পুরো প্রক্রিয়াটাই অস্বচ্ছ একটি পদ্ধতিতে ঘটেছে। এভাবে নবগঠিত নির্বাচন কমিশন আস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। যে তল্পিবাহক নির্বাচন কমিশন আমরা গত নির্বাচনে দেখেছি, তারই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে, এই আশঙ্কাই জনগণের মাঝে ফিরে এসেছে। *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মন্ত্রী-এমপিসহ সকল সরকারি কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে
গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি কেন বাড়বে না?

গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় হয় ২ হাজার ৫৪৯ কোটি ডলার। যে শ্রমিকেরা সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, দেশের সমুদয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে তারাই আজ সবচেয়ে অসুবিধায় দিন পার করছে। ২০১৩ সালের পর থেকে গত ৩ বছরে প্রত্যেক শিল্প এলাকায় বাড়ি ভাড়া বেড়েছে, অথচ শ্রমিকের মজুরী বাড়েনি। সরকার বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে কয়েক দফা যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শিকার শ্রমিকশ্রেণী। একদিকে তাদের বর্ধিত বিদ্যুৎ এবং গ্যাস এর ব্যবহার মূল্য বিল আকারে প্রত্যক্ষভাবে দিতে হচ্ছে, অন্যদিকে ওই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব প্রত্যেক পণ্যের মধ্যে পড়ছে। অথচ শ্রমিকের বেতন এই সময়কালে বাড়েনি। যানবাহনের ভাড়া বেড়েছে কয়েকগুণ, বাস ও রেলভাড়া সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়িয়েছে। কিন্তু শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি। এতে করে শ্রমিকের জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখন শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

গার্মেন্টস সেক্টরে বর্তমান নিম্নতম মজুরি অপর্যাপ্ত

২০১৩ সালে গার্মেন্টস সেক্টরে ন্যূনতম মজুরী ধার্য্য করা হয়েছে ৫৩০০ টাকা (৩০০০ মূল মজুরি + ১২০০ বাসা ভাড়া + চিকিৎসা ২৫০+ যাতায়াত ২০০+ খাদ্যভাতা ৬৫০ = ৫৩০০)। বর্তমান মজুরি যে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তা মজুরি কাঠামোতে প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া দেখলেই বোঝা যায়। ১২০০ টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে কোন শিল্প অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনি চিকিৎসা ভাতা, টিফিন ভাতা এবং মূল বেসিক বেতন সবই বাস্তবের এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। চিকিৎসা ভাতা ২৫০ টাকা মাত্র। যাতায়াত ভাতা ২০০ টাকা মাত্র, সর্বনিম্ন ভাড়া ৫ টাকায় যাতায়াত করলেও কেবল একজনের কর্মস্থলে আসা-যাওয়াতেই ২৬ কর্মদিবসে কমপক্ষে ২৬০ টাকা লাগে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার গঠিত নূর খান কমিশন জাতীয় ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা করেছিল ১৫৫ টাকা। তখন চালের মণ ছিল ৩০ টাকা। পাকিস্তান আমলের একজন শ্রমিক ১৫৫ টাকা ন্যূনতম মজুরীতে পাঁচ মণ চাল কিনতে পারলেও আজকে সে ন্যূনতম মজুরী ৫৩০০ টাকা দিয়ে ৩ মণের বেশি চাল কিনতে পারবে না। আজ স্বাধীনতার ৪০ বছরেও তাহলে কোন্ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন হলো? স্বাধীনতার পূর্বে আদমজী, ইস্পাহানী, লতিফ বাওয়ানীদের কারখানায় শ্রমিকদের থাকার জন্য কলোনী বা ব্যারাক ছিল, স্কুল-হাসপাতাল-খেলার মাঠ ছিল। আজ স্বাধীনতার পরে গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের থাকার জায়গা করে দেয়ার দায়িত্ব নিচ্ছেন না।

মজুরি বৃদ্ধি আজ সময়ের দাবি

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সরকার নতুন পে-স্কেল ঘোষণা করে সরকারি কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। সম্প্রতি বেতন বাড়ানো হয়েছে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রী-এমপিদের। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষিত হবে না কেন? শ্রমিকরাও তো একই বাজার থেকে কেনা-কাটা করে। সরকার দাবি করছে – দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, অচিরেই 'মধ্যম আয়ের দেশ' হতে যাচ্ছে, তাহলে শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হবে না কেন? দেশে জাতীয় আয় বাড়ার পেছনে শ্রমজীবী মানুষের অবদানই তো সবচেয়ে বেশি। শিল্প বাঁচানোর কথা বলে শ্রমিকদের মানবেতর জীবনে ফেলে রাখা হবে তা মেনে নেয়া যায় না। তাই আজ দাবি উঠেছে – শ্রমিকদের মানুষের মত বাঁচার উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও ঘোষণা করতে হবে।

গার্মেন্টস শিল্পের আয় বাড়ছে

বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। ২০২১ সালে পোশাক রপ্তানি পাঁচ হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। সব দেশের মোট রপ্তানি আয়ের(৩ হাজার ১২০ কোটি ডলার) প্রায় ৮২ শতাংশ। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের মোট পণ্য রপ্তানির ৮১ দশমিক ৬৬ শতাংশ বা ১ হাজার ৩১৩ কোটি ৫৫ লাখ ডলার পোশাক খাত থেকে এসেছে। এই আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে তা গত অর্থবছরের একই সময়ের ১ হাজার ২০২ কোটি ডলারের রপ্তানির চেয়ে ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাক-শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান দৈনিক প্রথম আলোকে বলেন "...আগামী ছয় মাস পোশাক রপ্তানি ভালো ছাড়া খারাপ হবে না।" একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। এখানে কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের পোশাকের রপ্তানি আয় ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ১১ দশমিক ৪১ শতাংশ।

বাংলাদেশে মজুরি প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম

সর্বনিম্ন মজুরি এখন ৫ হাজার ৩০০ টাকা। এটি অন্যান্য সকল গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশের চেয়ে অনেক কম। আইএলও-র 'Minimum wages in the global garment industry : Update for ২০১৫' প্রতিবেদন অনুসারে – ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি শ্রীলংকায় ৬৬-৮০ ডলার(দক্ষতাভেদে), বাংলাদেশে ৬৮ ডলার, ভারতে ৭৮-১৬৫ ডলার(রাজ্য ও দক্ষতার মান ভেদে), পাকিস্তান ৯৯-১১৯ ডলার, ভিয়েতনামে ১০০-১৪৫ ডলার, কম্বোডিয়া ১২৮ ডলার, ইন্দোনেশিয়া ৯২- ২১৩ ডলার, মালেশিয়া ২২৫-২৫৩ ডলার, চীন ১৬৫-২৯৭ ডলার(প্রদেশভেদে), তুরস্ক ৫১৭ ডলার, মেক্সিকো *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিদ্যাসাগর-রোকেয়ার স্বপ্নকে হত্যা করে বাল্যবিবাহকে বৈধ করার আয়োজন করছে সরকার

গত ২৪ নভেম্বর 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' শীর্ষক খসড়া বিল মন্ত্রী পরিষদ অনুমোদন করেছে। এই খসড়া আইনের ১৯ ধারায় মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৮ রাখা হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়েদের "সর্বোত্তম স্বার্থে" "আদালতের নির্দেশে"এবং মা-বাবার সম্মতিতে যেকোন মেয়ের বিবাহ "অপ্রাপ্তবয়স্ক" হতে পারবে। বাল্যবিবাহ নারীর মানবাধিকারের চরম লংঘন। আর "অপ্রাপ্তবয়স্ক" নারীর বিবাহ মানে তা শিশু বিবাহ। শিশু বিবাহের কারণে নারী শারীরিক-মানসিক, যৌন ও আর্থিক নির্যাতনের শিকার হয়। শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। সরকারের

রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গত ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের মতবিনিময় সভা

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশ বাল্যবিবাহ হচ্ছে। আর ইউনিসেফ প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২০১৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৭১ শতাংশ এবং শহরে ৫৪ শতাংশ মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পুনর্বাসন না করে হকার উচ্ছেদ
বাম মোর্চার বিক্ষোভ

হকারদের ওপর পুলিশী হামলার বিচার এবং পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বামমোর্চার অন্যতম নেতা গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য প্রদান করেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বহ্নিশিখা জামালী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নজরুল ইসলাম।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org